সুন্দরবন, উন্নয়ন ও সলতেনালি

মাহা মির্জা

সুন্দরবনবিনাশী রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ শুরুর আগেই এর ভয়াবহতা দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। মানুষ উচ্ছেদ, জমি দখল ছাড়াও এর আকর্ষণে নানা বাণিজ্যিক প্রকল্প এসে সুন্দরবন ঘিরে ফেলেছে। সরেজমিন এসব এলাকা ঘুরে, এলাকার মানুষের সাথে কথা বলে তৈরি হয়েছে এই লেখা। উন্নয়নের নামে একমুখি অন্ধ প্রাণধ্বংসী চিন্তার বিপরীত প্রস্তাবনাও হাজির করা হয়েছে এই লেখায়।

গ্রামের নাম বাঁশের হুলা। গ্রামের লোক বলে বাশুইলা। ছবির মতো সাজানো গ্রাম। নীল নদী, সবুজ ধান, খয়েরি মাটির রাস্তা, রাজহাঁসের পাল, মাছের পোনা, চরে বেড়ানো ছাগল-ভেড়া, গাছপাকা কলা-পেঁপে, একটু পর পর বাচ্চাদের স্কুল। বাগেরহাট সদর থেকে অনেক ভেতরে, কাটাখালী পার হয়ে চুলকাটি বাজারের মোড়, সেখান থেকে ভাগা বাজার হয়ে ইজি বাইক নিয়ে আরো গভীরে ঘণ্টাখানেকের পথ। আমি, তানিয়া, হাসান আর পরাগ। তানিয়ার হাতে সিরিয়াস ইনজুরি। রোড মার্চে দু-দুবারের পুলিশি হামলা। মাগুরা থেকে ভাঙা হাতটা টানছে। ছয় ঘণ্টার জন্য ইনজেকশন দেয়া আছে।

আমরা খুঁজছিলাম সলতেনালি। সুশান্তদার ডিরেকশন, ভাগা বাজার দিয়ে সইলতেনালি চলে যান, ওখানেই পাবেন, যা খুঁজছেন। মোড়ে মোড়ে জিজ্ঞেস করে খুঁজতে খুঁজতে গ্রামের চিকন পথ দিয়ে আরো ভেতরে যেতে যেতে দেখছি একের পর এক ছবির মতো সুন্দর সব গ্রাম।...চিত্রা, রাজনগর...আধোফোটা পদ্মপুকুর, ঘন বেগুনি কচুরিপানা, গোবরল্যাপা মাটির ঘর...

ঘণ্টা দুয়েক চলার পর একটা সরু নদী পড়ল সামনে। কী সুন্দর স্বচ্ছ নদী! জিজ্ঞেস করলাম, এই নদীর নাম কী? একজন বললেন, নদীর নাম সলিতেনালি! আমি আর তানিয়া অবাক! এতক্ষণ তাহলে একটা নদী খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম আমরা! কে জানত সলতেনালি গ্রাম নয়, ইউনিয়ন নয়, একটা ছোট্ট নদী! আর সেই ছোট্ট নদীর ধার ঘেঁষে গ্রামটার নাম বাশুইলা, যেখানে শহর পৌঁছায়নি এখনো।

এমন রূপবতী গ্রাম দেখলে মন কেমন করে। লাল সাদা পলকা ডটের জামা পরে ধানক্ষেতের আইলের ওপর দিয়ে ছোট ছোট মেয়েগুলো দৌড়াচ্ছে। সলতেনালি নদীতে একটু পর পর ভটভট করে ইঞ্জিনের নৌকা যায়। ঘাটে উল্টো করে শোয়ানো আছে ছোটবড় ডিঙি। এই নদী গিয়ে মিশেছে পশুরে। নদীর পানি ভরদুপুরের আকাশের মতো নীল। একটা চিকন বাঁশের সাঁকো চলে গেছে ওপারে। ওই পারেও একসময় এমন সবুজ ধানক্ষেত ছিল, মাছের ঘের ছিল, পদ্মপুকুর ছিল, মানুষের জীবন ছিল। ওই পারের নাম ছিল দুর্গাপুর। হিন্দু জনবসতি। বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে দুর্গাপুর নামের এই গ্রামটি এখন হারিয়ে গেছে। ওই পারে এখন বালুর পাহাড়। ওই পারে এখন ১০ ফুট উঁচু সিমেন্টের দেয়াল। ওই পারে এখন বিভীষিকা। ওই পারে যেতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিষেধাজ্ঞা। ওই পারে সর্বনাশী রামপাল পাওয়ার প্লান্ট।

জামারুল ভাই অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য। তিনি আমাদের মাটির পথ ধরে আরেকটু ভেতরে নিয়ে গেলেন। ছোটখাটো একজন মানুষ। তাঁর সম্বন্ধে খুব বেশি ধারণা নেই আমাদের। তবে সুশান্তদার চেনা লোক। টুকটাক আলাপে বোঝা গেল, প্লান্টের জন্য অধিগ্রহণ করা ১৮৩৪ একরের মধ্যে তাঁর কিছু জমি ছিল। সেটা হারিয়েছেন। মাঝখানে কৃষিজমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির প্ল্যাটফর্ম থেকে এলাকায় আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। সফল হয়নি। উল্টো মিথ্যা মামলায় জেলে গেছেন। ক্যামেরার সামনে মোটেই কথা বলতে চাইছিলেন না। আমরাও বুঝতে পারছিলাম, কেমন থমথমে একটা পরিবেশ।

সুশান্তদার সঙ্গে কথা হয়েছিল চুলকাটি বাজারে। তিনি বেশ সচ্ছল মানুষ। নিজের দোকানে বসেই কথা বললেন। সলতেনালির ওপারে বেশ খানিকটা জায়গাজমি ছিল তাঁর। মাছের ঘের ছিল। পাশাপাশি চালের ব্যবসা, গাড়ির টায়ারের ব্যবসা–এ রকম আরো কিছু। বারবার বলছিলেন, প্লান্টের কারণে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। ক্ষতিপূরণ যা পেয়েছেন তা খুব সামান্য। ২০১০ সাল থেকে কৃষিজমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির সভাপতি ছিলেন। প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন আন্দোলন মিটিং মিছিল হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারেননি। উচ্ছেদ হওয়া প্রায় দুই হাজার পরিবার যে যার মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। তাদের সবাইকে এখন আর 'ট্র্যাক' করাও সম্ভব নয়।

আমাদের প্রশ্ন ছিল, আন্দোলন গড়ে তোলা গেল না কেন?

উত্তরে যা বুঝলাম, রামপাল এলাকার ডেমোগ্রাফিটা আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক ছিল না। ফুলবাড়ীতে যেমন ফসলের মাঠের ওপর হাজার হাজার মানুষের দীর্ঘদিনের আদি বসতবাড়ি। এখানে তেমন নয়। নোনা পানির এলাকা, চিংড়ি চাষের সহায়ক। চিত্রা, রাজনগর, বাশুইলা...প্রায় প্রতিটি গ্রামেই দেখছিলাম নীল জাল দিয়ে ঘের দেওয়া মাছের পুকুর। তানজিম ভাই একদিন বলছিলেন, আশি ও নব্বইয়ের দশকে রামপাল ছিল বেশ সংঘাতপূর্ণ এলাকা। চিংড়িঘেরের দখল নিয়ে খুন-জখম ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ওই সময়গুলোতে মারপিট খুন দাঙ্গার মধ্য দিয়ে প্রচুর ফসলি জমি দখল হয়ে যায়। পরের কয়েক দশক ধরে হাতবদল হতে হতে এখন রামপাল উপজেলার বিশাল এলাকাজুড়ে কেবলই মাছের ঘের।

আশি ও নব্বইয়ের দশকে রামপাল ছিল বেশ সংঘাতপূর্ণ এলাকা। চিংড়িঘেরের দখল নিয়ে খুন-জখম ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ওই সময়গুলোতে মারপিট খুন দাঙ্গার মধ্য দিয়ে প্রচুর ফসলি জমি দখল হয়ে যায়। পরের কয়েক দশক ধরে হাতবদল হতে হতে এখন রামপাল উপজেলার বিশাল এলাকাজুড়ে কেবলই মাছের ঘের।

এলাকার মানুষের সাথে আলাপ করে যা বোঝা গেল, প্লান্টের জন্য অধিগ্রহণ করা ১৮৩৪ একর জমিতে বসবাস ছিল মূলত তিন ধরনের মানুষের–এক. ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বাস করা হতদরিদ্র জেলে কমিউনিটি, যারা মূলত নিম্নবর্গের হিন্দু। জমি অধিগ্রহণের সময় কিছু

ক্ষতিপূরণ তারা পেয়েছে, কিন্তু আন্দোলন গড়ে তোলার মতো শক্তি সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি। দুই. কিছুটা সচ্ছল ব্যবসায়ী, যারা একাধারে রামপালের বিভিন্ন জায়গায় চিংড়িঘেরের মালিক। অধিগ্রহণকৃত এলাকায় স্থায়ীভাবে থাকত না তারা। মাছের ঘের থাকায় ওই এলাকায় যাওয়া-আসা ছিল, অস্থায়ী বাড়িঘরও ছিল। এর মধ্যে যেমন সুশান্তদার মতো বড় ব্যবসায়ী আছেন, তেমনি নজরুল ভাই বা জামারুল ভাইদের মতো ছোট ঘেরের মালিকও আছেন। তিন. দরিদ্র দিনমজুর জেলে, যারা ওই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা নয়। কিন্তু রামপালে বিপুল পরিমাণ মাছের ঘের থাকায় অন্য এলাকা থেকে 'মাইগ্রেট' করে এসেছে কাজের খোঁজে। অনেক ক্ষেত্রে ঘেরের মালিকরা হয়তো নিজেরাই অন্য এলাকা থেকে তাদের নিয়ে এসেছে। এমন পাঁচমিশালি ডেমোগ্রাফিতে আন্দোলন গড়ে উঠবে না, সেটাই স্বাভাবিক। এরপর আছে ক্ষমতাসীন প্রভাবশালীদের উৎপাত, অত্যাচার। সুশান্তদা বলছিলেন, এ পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত এলাকার মাত্র ৪০০ একর জমির বালু ভরাট হয়েছে। বাকিটা প্লান্টের অসিলায় দখল করে নিয়েছে এলাকার প্রভাবশালীরা। সুশান্তদা একে একে নাম বলছিলেন–বাগেরহাট জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, খুলনার সাবেক মেয়র, এলাকার চেয়ারম্যান...সবাই মিলেমিশেই জোরজবরদস্তি করে দখলে নিয়েছে প্লান্টের পার্শ্ববর্তী বিশাল আবাদি এলাকা।

সলতেনালির ওপারে মাছের ঘের ছিল, এমন একজন নজরুল ভাই। নদীর পারেই তাঁর সঙ্গে দেখা। আমাদের দেখে বেশ রাগ করে বললেন, 'আপনারা তো ইন্টারভিউ নিয়ে খালাস, তারপর টিভিতে যখন সব দেখানো হয়, বিপদে পড়ি আমরা।' কথা যেহেতু সত্য, আমরা চুপ। তবে তিনি নিজের থেকেই অনেক কিছু জানালেন। ধারদেনা করে মাছের ঘের করেছিলেন। এখন ঋণগ্রস্ত, সর্বস্বান্ত। জিজ্ঞেস করেছিলাম, সরকার তো বলছে প্লান্ট হলে এই এলাকার উন্নয়ন হবে। শুনেই খেপে গেলেন, 'কিসের উন্নয়ন! প্লান্ট হলো তো আমার জমি গেল, আমার কিসের উন্নয়ন হলো?' হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে জমি রক্ষার যে আন্দোলন হচ্ছে, সেখানেও এমন কথা শুনেছি। উন্নয়নের কথা শুনলেই খেপে যান তাঁরা। বরং ভূমির অধিকার, ফসল ফলানোর অধিকারকেই তাঁরা উন্নয়ন মনে করেন।

রোড মার্চ কাটাখালী হয়ে ঢাকা ফিরে গেলে পরের দিন বাগেরহাট থেকে মংলা পর্যন্ত গিয়েছিলাম আমরা। উদ্দেশ্য ছিল, সাইনবোর্ড গুনব। বাস তো হুশ করে চলে যায়, পথে পথে থামে না। তাই আবারও সেই ইজি বাইক। সরকার হাইওয়েতে থ্রি হুইলার নিষিদ্ধ করেছে। সে কারণে বারবার বাজারে বাজারে আনসারের লোকেরা আটকে দিচ্ছিল। সৌভাগ্যবশত সঙ্গে ছিল ইমজামাম। বাংলামেইলের বাগেরহাট প্রতিনিধি। সাংবাদিক পরিচয়টা এত কাজে লাগে, এই প্রথম টের পেলাম। যেখানেই আটকে দিচ্ছে, ইমজামামকে দেখে আবার ছেড়েও দিচ্ছে। সাইনবোর্ড গোনার উদ্দেশ্যে এটুকু আইন ভঙ্গ করতে হলো। বাগেরহাট থেকে মংলা পৌঁছতে প্রায় ২৫ কিলোমিটার রাস্তা। রাস্তার দুধারে ক্ষেতখামার, সারি সারি মহিষ, চিকন বাঁশের খুঁটিতে ঘের দেওয়া নীল পানি। মহিষগুলো কেমন পানিতে গা ডুবিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঝিমাচ্ছে। কাটাখালী পার হয়ে মংলার দিকে কয়েক কিলোমিটার যেতেই হঠাৎ করে বেরসিকের মতো শুরু হলো সার বাঁধা সাইনবোর্ড। এর আগে তানজিম ভাই আর ইমজামাম ট্রলারে করে পশুর নদী দিয়ে প্লান্টের সীমানা পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন। যাওয়া-আসার পথে পশুর নদীর দুই ধারে ২২টি সাইনবোর্ড গুনেছেন। খুলনা-মংলা হাইওয়েতে আমরাও পেলাম দুই ডজনের মতো সাইনবোর্ড।

রাস্তার দুপাশের বিপুল পরিমাণ জমি, মাছের ঘের, ক্ষেতখামার ইতিমধ্যেই অধিগ্রহণ করে খুঁটি গেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিছুদূর পর পর কত রকমের সাইনবোর্ড! মংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, সেনা কল্যাণ সংস্থার ৫.৮ একর, ইনডেক্স পাওয়ার লিমিটেডের এলপিজি বটলিং প্লান্ট, সাগর এন্টারপ্রাইজ, নাভানা লিমিটেড, জনৈক হাফিজুর রহমান তুহিন। সবগুলো সাইনবোর্ডের নিচেই ঢাকা অফিসের নম্বর দেওয়া। গোটা সুন্দরবনের আশপাশের এলাকা তথাকথিত শিল্পায়নের জন্য প্রস্তুত। গত বছর মোদি ঢাকায় এলে ভেড়ামারা আর মংলায় দুটি স্পেশাল ইকোনমিক জোনের চুক্তি হয়েছিল। লোকমুখে শুনলাম, টাটার মোটর প্লান্ট হবে মংলায়। সুন্দরবনকে বিষিয়ে রামপাল প্লান্টের বিদ্যুৎ যাবে ভারতীয় স্পেশাল ইকোনমিক জোনে। তো, কার উন্নয়ন হলো?

সেই সলতেনালিতেই আবার ফিরে আসি। ছোট্ট নদীর এপার-ওপার। ২০২০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবার কথা। তারপর? ওই পারের কয়লাপোড়া ম্যাগনেসিয়াম, ওই পারের সালফার ডাই-অক্সাইড, ওই পারের রেডিয়াম-ক্রোমিয়াম, ওই পারের সাতচল্লিশ লাখ টন কয়লাপোড়া বাতাস এই পারের মানুষগুলোর ফুসফুসে বাসা বাঁধবে না? এপারের রোপা আমন, এপারের পদ্মফুল, এপারের বীজতলা, এপারের শ্বাসমূলে লেড, মার্কারি, ফ্লাই অ্যাশ ভাসবে না? আমরা কসমোপলিটনের মানুষ বিদ্যুৎ পাব ঠিকই। তথাকথিত ইন্ডাস্ট্রিওয়ালারাও বিদ্যুৎ পাবে। অপ্রতিরোধ্য গতিতে উন্নয়নও হবে। আর বাগুইলার মানুষ? চিত্রার মানুষ? রাজনগরের মানুষ? কাশতে কাশতে ধুঁকতে ধুঁকতে, হাতে-পায়ে ঘা পাঁচরা নিয়ে বাঁচবে? রাজধানীর মানুষকে বিদ্যুৎ দিতে গিয়ে বাগুইলা আর চিত্রার ঘরে ঘরে ক্যান্সার হবে?

গত বছর মোদি ঢাকায় এলে ভেড়ামারা আর মংলায় দুটি স্পেশাল ইকোনমিক জোনের চুক্তি হয়েছিল। লোকমুখে শুনলাম, টাটার মোটর প্লান্ট হবে মংলায়। সুন্দরবনকে বিষিয়ে রামপাল প্লান্টের বিদ্যুৎ যাবে ভারতীয় স্পেশাল ইকোনমিক জোনে। তো, কার উন্নয়ন হলো?

এ তো সেই কলোনিয়াল যুগের উন্নয়ন! কালো মানুষকে দাস বানিয়ে যেমন উন্নয়ন হয়েছিল সাদা মানুষের। উপমহাদেশকে কলোনি বানিয়ে যেমন শিল্পায়ন হয়েছিল ব্রিটেনে। পূর্ব বাংলায় লুটপাট চালিয়ে যেমন তিলোত্তমা হয়েছিল পশ্চিমের ইসলামাবাদ। এই যে প্রান্তিক মানুষ উচ্ছেদ করে শহুরে মানুষের উন্নয়ন, শিল্পের নামে কৃষক উচ্ছেদ, চা শ্রমিকের জমি কেড়ে নিয়ে ইকোনমিক জোন, ফসলি মাঠ কেড়ে নিয়ে তার ওপর কয়লাখনি–এসব আক্ষরিক অর্থেই উন্নয়নের কলোনিয়াল ধারণা। এই যে সলতেনালিপারের জনপদ, সেই অর্থে একটা নিও-কলোনি।

তবে কি শিল্পায়ন হবে না? উন্নয়ন হবে না?

অবশ্যই হবে। তবে কার জীবনে উন্নতি আনতে কতটুকু উন্নয়ন হবে, সেই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েক দশকে দেশে কৃষিজমি কমেছে আশঙ্কাজনকভাবে, খাদ্য নিরাপত্তা আছে ক্রমশ ঝুঁকির মধ্যে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মাত্র তিন বছরেই কৃষিজমি কমেছে প্রায় ৩.৪৫ লাখ হেক্টর। সেই কৃষিকে আরো সংকুচিত করে কেমন করে হয় উন্নয়ন?

বলা হয়, কৃষি খাত ঝুঁকিপূর্ণ, অলাভজনক। জিডিপিতে শিল্পের

তুলনায় অবদান কম। যাঁরা এসব বলেন, ষোলো কোটি মানুষের খাদ্য কোত্থেকে আসবে সেই চিন্তার দায় তাঁদের নেই। পৃথিবীর সব দেশেই কৃষি ঝুঁকিপূর্ণ। তুলনামূলকভাবে অলাভজনকও। আর সে কারণেই কৃষি খাত বাঁচাতে ইউরোপ-আমারিকায় বিপুল পরিমান ভর্তুকি দেওয়া হয় বছর বছর।

উন্নয়ন বা শিল্পায়ন যা-ই বলি না কেন, তা হওয়া দরকার এলাকা বা লোকালয়ভিত্তিক। প্রান্তিক মানুষের অর্থনীতির সাথে সংগতিপূর্ণ। একেকটি এলাকার জনজীবন, নদী, পানি, গাছপালা, কৃষিকে আমলে নিয়ে। সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকায়ও 'শিল্পায়ন' সম্ভব। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুল্লাহ হারুন বলছিলেন, এত এত মাছ সুন্দরবনসংলগ্ন সবগুলো নদীতে, ইন্ডাস্ট্রি করতে চাইলে ফিশ প্রসেসিং প্লান্ট করেন। ওই এলাকায় বছরজুড়ে জালের ক্রমাগত চাহিদা থাকে, জালের ম্যানুফাকচারিংও তো একটা শিল্প। দুবলার চর এলাকায় শুঁটকি শিল্প প্রসারের ব্যাপক সম্ভাবনা, আর প্রচুর পরিমাণ মাছ যেখানে আছে, সেখানে বরফকলও একটা শিল্প। তবে হ্যাঁ, লোকালরা অনেকেই মনে করেন, সুন্দরবনের ভেতরের নদনদীতে মাছ ধরা বন্ধ করাই ভালো। ইমজামাম বলছিলেন, সুন্দরবনকে অভয়াশ্রম ঘোষণা করে মাছের ব্রিডিং গ্রাউন্ড হিসেবে সংরক্ষণ করা গেলে সুন্দরবনসংলগ্ন পশুর নদী, রূপসা চ্যানেল, শিবসা বা বলেশ্বরের মতো নদীগুলোতে মাছ পাওয়া যেত আরো বেশি।

প্রবাদ আছে বাগেরহাটে, 'নারিকেল, পান সুপারির হাট, দুইয়ে মিলে বাগেরহাট।' ইমজামাম বলছিলেন, নারিকেল ছোবড়া কাজে লাগিয়ে বাগেরহাটে গড়ে উঠেছে একটা সম্ভাবনাময় দেশীয় শিল্প। ছোবড়া থেকে আঁশ আর আঁশ থেকে বিছানার ম্যাট্রেস। বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। এখন আর এলাকায় নারিকেল ছোবড়া পড়ে থাকে না। ঝালকাঠি থেকে ট্রলারে করেও আসে ছোবড়া।

তা ছাড়া শিল্পায়নের কথা বলবেন, অথচ রাষ্ট্রায়ত্ত এতগুলো কারখানা দীর্ঘদিন ধরে বিনিয়োগের অভাবে ধুঁকছে–চিনি, নিউজপ্রিন্ট, পাট–সেখানে উন্নয়ন চোখে পড়ে না রাষ্ট্রের?

গোটা একটা খুলনা নগরী এই দেশের এক অপার সম্ভাবনাময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট হতে পারত, অথচ সেখানে কোনো বিনিয়োগ নেই। খুলনার মানুষ ঢাকায় আসে কাজের খোঁজে। অথচ খালিশপুর এলাকায় বন্ধ হয়ে আছে কত পাটকল। বিসিক শিল্পনগরীর ভেতরে খালি পড়ে আছে কত জমি। ব্যবসায়ীরা বলেন, আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় সেখানে জমি বরাদ্দ পাওয়া যায় না। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কোরীয় ইপিজেডের জন্য বরাদ্দ প্রায় আড়াই হাজার একর জমির বিশাল অংশ এখনো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ১৭ বছরেও কাজে লাগানো যায়নি। ভারতের উদাহরণ তো সামনেই আছে। স্বাধীনতার পর থেকে উন্নয়নের নামে ৪৫ মিলিয়ন প্রান্তিক মানুষকে উচ্ছেদ করেছে ভারতীয় রাষ্ট্র। বিপরীতে তথাকথিত ইকোনমিক জোনগুলোতে চাকরি হয়েছে মাত্র আড়াই লাখ মানুষের। এ ছাড়া ভারতের ১৮টি এসইজেডে জরিপ করে দেখা গেছে, মোট চার হাজার হেক্টর জমির মাত্র ১৬ শতাংশ জমিতে ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট হয়েছে। অর্থাৎ কর্মসংস্থানের অজুহাতে ফসলি জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, কৃষক উচ্ছেদ হচ্ছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত জমি খালি পড়ে থাকছে, কাজে লাগানো যাচ্ছে না। নতুন নতুন কৃষিজমি খুঁজে বের করে, জবরদখল করে, মোটা অঙ্কের কমিশনের বদলে তা প্রাইভেট কোম্পানির হাতে তুলে দিলেই কেবল উন্নয়ন হয়?

আর বিদ্যুতের প্রশ্নে বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘমেয়াদি বিকল্প দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রায়ত্ত গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর উৎপাদনশীলতা আর সক্ষমতা বৃদ্ধির পথ বাতলে দিয়েছেন, বিভিন্ন ধরনের ফসিল ফুয়েলের সমন্বয়ে 'এনার্জি মিক্স'-এর কথা বলেছেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানির সম্ভাবনার কথা বলেছেন, বাপেক্সকে শক্তিশালী করার কথা বলেছেন।

এতসব কিছুর পরও প্লান্টের নির্মাণকাজ শুরু হয়। বালু ভরাট হয়। দশ ফুট উঁচু পাঁচিল ওঠে। সুন্দরবনের নদী, গাছ, মাছ, পানি, পাতা মেরে ফেলার সুপারক্রিটিক্যাল মেশিন তৈরি হয়। সলতেনালির মানুষ ভয়ে ভয়ে ওপারে তাকায়। কয়লাপোড়া কালো বিষের উন্নয়নে জীবন কীভাবে বাঁচবে?

মাহা মির্জা: গবেষক
ইমেইল: maha.z.mirza@gmail.com

সাইকেল মিছিলে জলকামানের হামলা